পঁচিশ টাকা

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

।।১২২।।

অগ্রহায়ণ ১৪২৭ • একাদশ সংখ্যা • ১২২তম বর্ষ • উদ্বোধন কার্যালয় • কলকাতা

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

॥ ১২২ ॥

১২২তম বর্ষ ● ১১শ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৪২৭ ● নভেম্বর ২০২০

সূ চি প ত্র

■ দিব্যবাণী ➤ ৯৬৭
■ কথাপ্রসঙ্গে
'যে জন আছে মাঝখানে' ➤ ৯৬৮
■ অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
গীতা—অধ্যাপক শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ ➤ ৯৭১
■ শাস্ত্র
অথ বৃহদারণ্যক কথা—স্বামী অলোকানন্দ ➤ ৯৭২
■ নিবন্ধ
শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির ইতিবৃত্ত—
স্বামী চেতনানন্দ ➤ ৯৭৬
ভারতবর্ষে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীতে ব্রত-অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা—রত্নাবলী বন্দ্যোপাধ্যায় ➤ ৯৮২
শ্রীরামকৃষ্ণের করুণায় সিক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়—
অরিন্দম দাস ➤ ৯৯০
ভাষার 'পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যা' সম্পর্কের খোঁজে
শব্দশরীর: প্রত্নরূপ ও রূপভেদ—
পতিতপাবন পাল ➤ ১০০৯
■ শিল্প
উনিশ শতকের কলকাতায় কোম্পানি শৈলীর চিত্রকলা: দরবারি শিল্পীর কারিগর হয়ে ওঠার এক কাহিনী—
অঙ্কন পুরকাইত ➤ ৯৯৬
■ লোকসংস্কৃতি
মৌনমুখর টেরাকোটা—অপূর্ব চট্টোপাধ্যায় ➤ ১০০৪
■ সাধুসঙ্গ
সারগাছির স্মৃতি—স্বামী সুহিতানন্দ ➤ ১০০৭
■ ইতিহাস
ভারতের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ—
গৌতম মুখোপাধ্যায় ➤ ১০১৩
■ স্বাস্থ্য
কিভাবে ভোরে ঘুম থেকে উঠবেন—
কুনাল ভট্টাচার্য ➤ ১০২২
■ চিরন্তনী
তপস্যাই সর্বসিদ্ধির উপায়—সুমনা সাহা ➤ ১০১৮
■ তরুণের পৃষ্ঠা
মারাদোনা এক ব্যতিক্রমী চরিত্র—অরুণাভ গুপ্ত ➤ ১০২০
■ প্রচ্ছদ-পরিচিতি
রামকৃষ্ণ মিশন, শিলং—রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ➤ ১০২৩
■ কবিতা
কূপমণ্ডুক—অসীম চৌধুরী ➤ ১০০২
আপনজন—স্বামী পবিত্রচিত্তানন্দ ➤ ১০০২
দিতে পারি—অসীমকুমার মুখোপাধ্যায় ➤ ১০০২
বক—শুভঙ্কর দাস ➤ ১০০৩
তিনি জানেন—স্বপন মুখার্জি ➤ ১০০৩
অচিন রোশনাই—স্বাতী গোস্বামী ➤ ১০০৩
জিজ্ঞাসা—অজন্তা আচার্য ➤ ১০০৩
কৃষ্ণ—নিত্যানন্দ দাস ➤ ১০০৩
■ প্রাসঙ্গিকী
প্রসঙ্গ: শ্রীরামকথা ➤ ১০২৪
প্রসঙ্গ: 'উদ্বোধন' ➤ ১০২৪
কৃপাধন্য কলাইঘাটা তীর্থভূমি ➤ ১০২৫
■ গ্রন্থ-পরিচয়
অনন্যা রানি রাসমণি—পার্বতী সেন ভট্টাচার্য ➤ ১০২৬
■ সংবাদ
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ ➤ ১০২৭
শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির সংবাদ ➤ ১০২৮
বিবিধ সংবাদ ➤ ১০২৮
■ অন্যান্য
শব্দচেতনা ২৩৩ ➤ ৯৭৫
সমাধান : শব্দচেতনা ২৩১ ➤ ১০০৬
অনুষ্ঠানসূচি (পৌষ ১৪২৭) ➤ ১০১৭
ছুটির নির্ঘণ্ট (পৌষ ১৪২৭) ➤ ১০২১
বিজ্ঞপ্তি ➤ ৯৮১, ১০০৬

সম্পাদক : স্বামী শিবার্চনানন্দ
ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টিগণের পক্ষে স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডিটিপি-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ♦ ব্যক্তিগত সংগ্রহ ১৩০ টাকা; সডাক: ১৬০ টাকা ♦ প্রতি সংখ্যার মূল্য: ২৫ টাকা

শিল্প

উনিশ শতকের কলকাতায় কোম্পানি শৈলীর চিত্রকলা: দরবারি শিল্পীর কারিগর হয়ে ওঠার এক কাহিনী

অঙ্কন পুরকাইত

গবেষক, ইসলামীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতা এক সমৃদ্ধ নগরী হিসাবে গড়ে ওঠে। প্রশস্ত রাজপথ, তোরণদ্বার, সুবৃহৎ বিতান-যুক্ত অট্টালিকা—এই সবের মধ্যেই পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য। এমনকি স্থাপত্যশৈলীতেও অ্যাংলো গথিক অথবা নিও ক্লাসিক্যাল শৈলীর প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। তাই Thomas এবং William Daniell লিখছেন: "the bamboo roof suddenly vanished; marble coloumn took the place of the brick walls."[১] এমনকি Maria Nugent ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ অক্টোবর লিখছেন: "...and we then were delighted with the scene—Fort William, the buildings of Calcutta, the banks of the river, and the odd shaped boats, formed a very striking and really beautiful scene."[২] তবে কলকাতা নগরীর এই পরিকল্পনাবিহীন বিষম আকৃতির মৃত্তিকানির্মিত বাড়িঘর থেকে উন্নত পরিকল্পনাযুক্ত সুষম অট্টালিকার চিত্রানুগ পরিবর্তন অতি সহজেই হয়ে ওঠেনি। এমনকি কলকাতা নগরী যে সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধিলাভ করেছিল তাও বলা যাবে না।

কলকাতা নগরী মোটামুটিভাবে দুইভাগে বিভক্ত ছিল। এক প্রান্তে অবস্থান করত তথাকথিত সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষজন—বিশেষ করে ইংরেজ সাহেবরা, যেখান থেকে সমগ্র নগরীর প্রশাসনিক কার্যকলাপ পরিচালিত হতো। নগরীর এই বিশেষ অংশটি পরিচিত ছিল 'শ্বেতাঙ্গ নগরী' বা 'white town' হিসাবে। অপরদিকে নগরীর অন্য প্রান্তে অবস্থান করত মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ—যেমন কারিগর, শ্রমিক, কুলি, মজুর ইত্যাদি। শহরের এই প্রান্তটি পরিচিত ছিল 'কৃষ্ণাঙ্গ নগরী' অথবা 'black town' হিসাবে। যদিও নগরীর সমস্ত প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ চালিত হতো শ্বেতাঙ্গ নগরী দ্বারা, কিন্তু নগরীর মূল চালিকাশক্তি বা উৎপাদনব্যবস্থার মূলে ছিল সাধারণ মানুষজন। ইংরেজদের মতে, এই কৃষ্ণাঙ্গরা ছিল অসভ্য এবং বর্বর; এদের 'শিক্ষিত' করার লক্ষ্যে এবং সরকারের প্রতি জনসাধারণ যাতে আনুগত্য স্বীকার করে তার জন্য ইংরেজ সরকার নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে C. E. Trevalyan-এর বক্তব্য উল্লেখ্য—"Trained by us to happiness and independence, and endowed with our learning and political institutions, India will remain the proudest monument of British benevolence."[৩] এই সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে Macaulay সাহেব শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন আনেন এবং শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কমিশন গঠন করা হয়। এরকমই Sir Charles Wood-এর নেতৃত্বাধীন কমিশন ভারতবর্ষে শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর জন্য প্রথমে কলকাতা, পরে বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব দেয়।

শিক্ষার পাশাপাশি পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ প্রাচ্য শিল্পকলাকেও ভিত্তিহীন মনে করতেন এবং শিল্পকলার মৌলিকত্বকেও অস্বীকার করতেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁর আলোকে উদ্ভাসিত পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে ভারতীয় শিল্পকলা বহুদিন অবধি কোনরকম প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাদের মনে হয়েছিল, ভারতীয় শিল্পকলায় কোনরূপ নতুনত্ব নেই, কোন দর্শন নেই, কোন আলো-ছায়ার ব্যবহার নেই; এগুলি তাদের মতে শিল্প-পদবাচ্যই ছিল না। যেমন Westmecott বলেছিলেন: "there is no temptation to dwell at length on the sculpture of Hindusthan. It affords no assistance in tracing the history of art and debased quality deprives it of all interest as a phase of Fine Art, the point of view from which it have to be considered."[৪] এই ভারতীয় শিল্প এবং শিল্পীকে পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষায় প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে ইংরেজরা ভারতবর্ষে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পশিক্ষা প্রদানে সচেষ্ট হয়। এই পাশ্চাত্য শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় শিল্পীদের পরিপ্রেক্ষিত ও আলো-ছায়ার ব্যবহার এবং

সমতা বা যাকে বলা যায় 'সিমেট্রি'র জ্ঞানে দীক্ষিত করা, এই শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ভারতীয় শিল্পীদের পাশ্চাত্য শিল্পের নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোই ছিল না, এর এক গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, যা একদিন ভারতবর্ষে বণিক সংগঠন হিসাবে আসে, এক বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এবং এই রাজনৈতিক শক্তিকে ভারতবর্ষের বুকে দীর্ঘজীবী করার জন্য বিভিন্ন প্রান্তের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সঠিক মানচিত্রের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এই সার্ভে ম্যাপ এবং বোট্যানিক্যাল ড্রয়িং সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যই ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় 'মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউশন'। এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের কারিগরি শিক্ষা দেওয়া। ঠিক তার দশ বছর পরে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় 'সোসাইটি ফর প্রোমোশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট'। এই প্রতিষ্ঠান পরে গিয়ে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট' নামে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে E. B. Havell কলকাতার এই গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট-এর অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। হ্যাভেলের নেতৃত্বে ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বলতে গেলে, হ্যাভেলই সেই প্রথম ইউরোপীয়, যিনি ভারতীয় শিল্পকে তার নিজ দর্শন এবং ধ্যানস্বরূপে চিনতে পেরেছিলেন। তাই তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সরকারি আর্ট স্কুলেই ভারতীয় চারু এবং কারুকলার পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট হন। তিনিই প্রথম ইউরোপীয়, যিনি বুঝেছিলেন ভারতীয় শিল্পী কেবলমাত্র তাদের পূর্বপুরুষের করা শিল্প নকল করে না, তাদের এক গভীর শিল্প-মনীষা আছে এবং তিনি নিজে সেই শিল্পীদের খোঁজ করতে উদ্যোগী হন। এভাবেই একদিন পাটনায় দেখা মেলে লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের, যাঁর পূর্বপুরুষ কাজ করতেন নবাবি দরবারে। নবাবের দিন শেষ হলে এই শিল্পীর আত্মীয়রা জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় আসতে বাধ্য হন এবং সাহেবদের আশ্রয়গ্রহণ করেন। সাহেবরা তাঁদের দিয়ে সার্ভে ম্যাপ, বোটানিক্যাল ড্রয়িং এবং প্রিন্টিং প্রেসের নানাবিধ কাজ করাত। ঈশ্বরীপ্রসাদও একদিন এইভাবেই এসে পৌঁছেছিলেন পাটনায় কোন এক সাহেবের ছাপাখানায় কাজ করার উদ্দেশে। কিন্তু কিভাবে এই দরবারি শিল্পীরা সাহেবদের অধস্তন কারিগরে রূপান্তরিত হয়, সেটা বুঝতে গেলে কোম্পানি চিত্রকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। তাই অধ্যাপক রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন: "এই যে কাহিনী, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে ভারতীয় শিল্পীদের শ্রেণিচ্যুত হওয়ার ইতিহাস। একদিন যাঁরা নবাবদের দরবারে অভিজাত পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে শিল্পকর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন, নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতেন অভিজাত রুচি ও নান্দনিক চিন্তায়, তাঁরা কলকাতায় এসে হয়ে গেলেন সাহেবদের চাকর—তাঁদের ভাষা, বক্তব্য, মতাদর্শ কিছুই আর গ্রাহ্য নয় পৃষ্ঠপোষকের কাছে।"[৫]

ভারতবর্ষে কোম্পানি চিত্রকলার প্রথম আবির্ভাব ঘটে দক্ষিণভারতের তাঞ্জর এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে। দক্ষিণভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রায় ১৭০২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইতালীয় পরিব্রাজক Niccolao Manucci ভারতীয় শিল্পীদের দিয়ে প্রায় আটাত্তরটি ছবি আঁকান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Storia do Mogor*-এর জন্য। এই ছবিগুলির বিষয়বস্তু ছিল মূলত বিভিন্ন পেশা এবং ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন। তাই Mildred Archer আবার লিখছেন: "In the first year of the eighteenth century he was engaged on the fourth volume of this work which described Indian manners and customs, and he wanted illustration for it which he could dispatch with the manuscript to Europe."[৬] অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অ্যাংলো-মাইসোর যুদ্ধের ফলে দক্ষিণভারতের শিল্পীরা তাদের রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে এই যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের কাছে সার্ভে ম্যাপের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। তখনি ডাক পড়ে দরবারি শিল্পী বা ওস্তাদের একজন শিল্পী হিসাবে নয়, একজন কোম্পানি পেইন্টার বা ম্যাপ-মেকার হিসাবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে 'কোম্পানি চিত্রকলা' দক্ষিণভারত থেকে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বভারতে নবাবদের রাজধানী মুর্শিদাবাদে কোম্পানি চিত্রকলার প্রথম আবির্ভাব ঘটে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর নবাবদের দিন প্রায় শেষ হয়ে আসে এবং বিশেষ করে বক্সারের যুদ্ধের পর সুবে-বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজ সাহেবদের হাতে। এই পরিস্থিতিতে দরবারি শিল্পীরা নতুন পৃষ্ঠপোষকের খোঁজে সাহেবদের দ্বারস্থ হয়। প্রথমদিকে এই দরবারি শিল্পীদের দিয়ে আঁকা প্রতিকৃতি চিত্রে দরবারি অনুচিত্রের আঙ্গিক এবং চিত্ররীতি খুবই পরিষ্কার। এখানে

মনে রাখা প্রয়োজন যে, দরবারি শিল্পীরা তাদের শিল্পের বিষয়বস্তু এবং শিল্পসামগ্রী দুইয়ের জন্যই নবাবদের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। কাজেই নবাব এবং তার একান্ত অনুগতজনই থাকত সেই চিত্রভূমির কেন্দ্রস্থলে। এই নবাবদের জায়গায় যখন তারা সাহেবদের প্রতিকৃতি-চিত্র আঁকতে শুরু করে, তখন চিত্রভূমির বিভাজন, মানুষের অঙ্গবিন্যাস—সব একই থেকে যায়, কেবল ব্যক্তি মানুষটি পালটে যায়। এই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যদি আমরা দ্বিপচান্দের আঁকা ফুলার্টনের একটি প্রতিকৃতি-

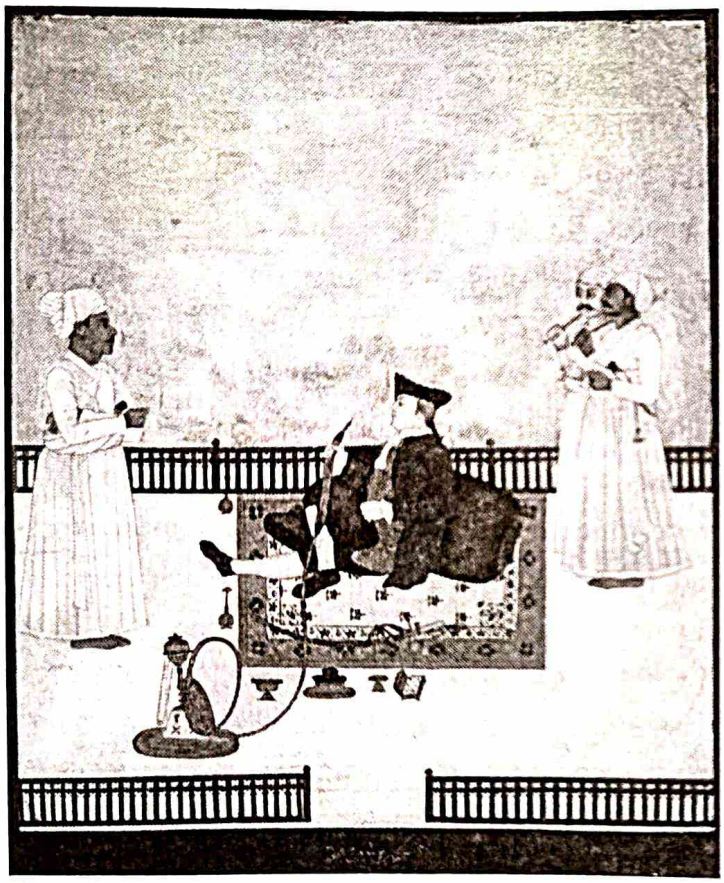

চিত্রের দিকে তাকাই। ছবিটির মধ্যে পরিপ্রেক্ষিতের ধারণা প্রায় নেই বললেই চলে, এমনকি চিত্রভূমির বিন্যাসও অনেকটাই দরবারি চিত্রের মতো যেখানে ফুলার্টন সাহেব একটি জাজিমের ওপর আসীন কিন্তু তাঁর পোশাক ও অঙ্গবিন্যাস একেবারেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। একই ছবির এই চিত্র-আঙ্গিকের বৈপরীত্যের মধ্যেই শিল্পী-মানসের এবং বৃহত্তর সমাজের যে-টানাপোড়েন তা লক্ষিত হয়। তাই Archer বলেছেন: "Actually, when the Nawabs were no longer sitting with gold dinars in their pockets to give patronage to these artists, the latter substituted anyone with their perception schema who was ready to play the social role."[৭]

সময়ের সাথে সাথে দরবারি শিল্পীদের দিয়ে আঁকা সাহেবদের প্রতিকৃতি-চিত্রে পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাব আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ছবিগুলির আঙ্গিক এবং বিন্যাসগত পরিবর্তন আরো পরিষ্কার লক্ষ্য করা যাবে যদি আমরা মুর্শিদাবাদে আঁকা অন্য ছবিটির দিকে তাকাই। এই ছবিটির মধ্যে পরিপ্রেক্ষিতের ধারণা অনেকটাই লক্ষ্য করা যায়—বিশেষ করে দৃশ্যভূমির সম্মুখ ভাগের গাছটির নিরিখে যেভাবে নদীর ওপারের গাছগুলিকে দেখানো হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, সামনের এবং দূরের বস্তুর যে আকৃতিগত পরিবর্তন হওয়া উচিত সেসম্পর্কে শিল্পীর ধারণা অনেকটাই পরিষ্কার বা আগের থেকে উন্নত বলা যায়। শুধু পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহারই নয়, আলো-ছায়ার ব্যবহারও

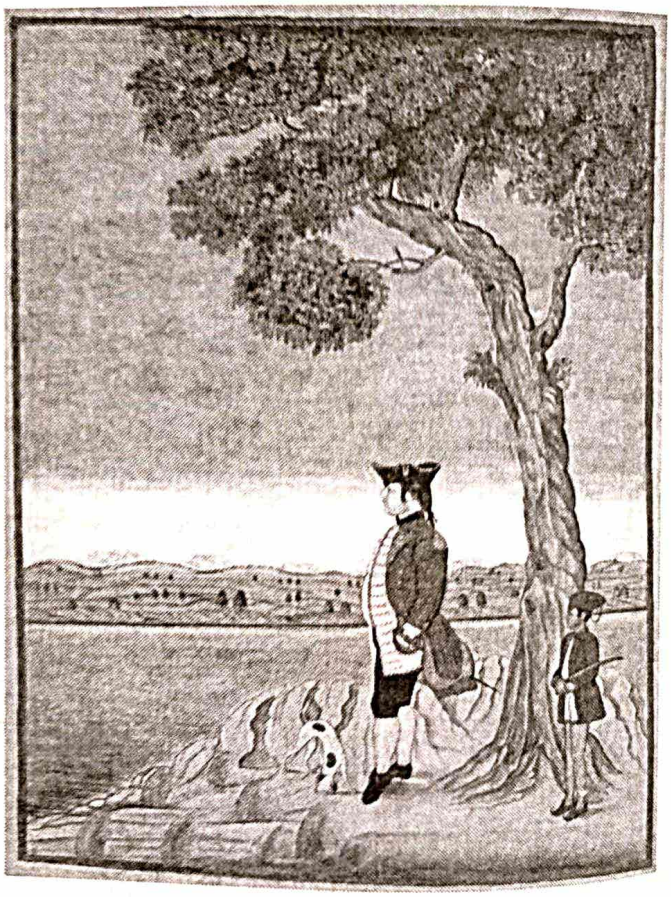

লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে সাহেব এবং তার কুকুরটির পায়ের কাছে। এই ছবিটির মধ্যে পাশ্চাত্য শিল্প-আঙ্গিকের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলেও নদী-তীরবর্তী প্রস্তরখণ্ড এবং ভূমির বিন্যাসে দরবারি শিল্প-আঙ্গিকের প্রভাব পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়। শৈল্পিক এবং আঙ্গিকগত পরিবর্তনের পাশাপাশি ছবিটির বস্তুগত পরিবর্তনও লক্ষ্য করার মতো। মোটা জলরঙের পরিবর্তে স্বচ্ছ জলরঙের ব্যবহার, ছবির চারিদিকে মোটা কালো বর্ডার—এসবের মধ্যেই ছিল পাশ্চাত্য শিল্পের প্রভাব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুর্শিদাবাদ তার নিজস্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি একেবারেই হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্টের ফলে কলকাতা হয়ে ওঠে ইংরেজ গভর্নরের সদর দপ্তর। তারপর ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে নবাবদের টাঁকশালও বন্ধ করে দেওয়া হয়। এইভাবেই উনিশ শতকের প্রথম ভাগে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কলকাতা হয়ে ওঠে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের এক প্রধান শহর। তখন স্বাভাবিকভাবেই পুরানো রাজধানী মুর্শিদাবাদকে ছেড়ে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ এসে ভিড় করে কলকাতার উত্তর এবং দক্ষিণে কালীঘাট অঞ্চলে। এই বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষের মধ্যে ছিল দরবারি শিল্পীরাও, যাঁরা এসেছিলেন নতুন পৃষ্ঠপোষক ও জীবিকা অর্জনের সন্ধানে। এই দরবারি শিল্পীরা ছাড়াও, হুগলি নদীর পূর্বপাড়ের এই নতুন শহরটিতে এসেছিলেন আর-এক দল শিল্পী, যাঁদের চিত্ররীতি, আঙ্গিক ও বিন্যাস ছিল একেবারেই ভিন্ন। এমনকি এই শিল্পীদের সাথে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকের যে-শ্রেণিসম্পর্ক, তাও ছিল একেবারেই বিপরীত। "তাঁদের শিক্ষা বিদেশের আর্ট স্কুলে, তাঁদের দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে পিকচারস্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁরা খুঁজছিলেন ওরিয়েন্টের প্রাসাদ, গভীর জঙ্গল, কালো মানুষ, নানা পোশাক, নানা আচার-অনুষ্ঠান—যা তারা আরব্য রজনীর উপন্যাসে, মিশনারীদের বিবরণে ও ভ্রমণকারীদের রোমান্টিক আখ্যানে সন্ধান পেয়েছিলেন। এইভাবেই একে একে এলেন ডানিয়েলরা, এলেন চার্লস ডয়লি, এমনকি অ্যাকাডেমির ডিগ্রীধারী জন জোফানি। এঁদের তুলিতে কলকাতা হয়ে উঠল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সার্থক প্রয়াস। এর সব থেকে বড় প্রকাশ হলো জোফানির আঁকা ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর স্ত্রীর প্রতিকৃতি।"[৮]

এই পাশ্চাত্য শিল্পীদের আগমনের ফলে উনিশ শতকের কলকাতার শিল্প ও সংস্কৃতির জগতে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অদ্যাবধি যে দরবারি চিত্র আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে নবাবদের দরবারে এবং অভিজাতবর্গের গৃহে শোভা পেত, তার জায়গায় ইংল্যান্ডের অ্যাকাডেমি রীতিতে আঁকা তেলরঙের ছবি আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে অনেক বেশি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এই ছবিগুলির পৃষ্ঠপোষকের তালিকায় ছিলেন—"পাথুরিয়াঘাটার গোপীনাথ ঠাকুর ও তাঁর বংশধররা, বর্ধমান ও পাইকপাড়ার মহারাজেরা এবং আরো অনেক ধনী অভিজাত মানুষ। উনিশ শতকের প্রথমভাগ থেকেই ইংরেজ শিল্পীদের দিয়ে পরিবারের জন্য প্রতিকৃতি আঁকানোর রেওয়াজ চালু হয়। শুধু ধনীরাই নন, কলকাতার ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ঘরেও স্থান পেতে থাকে ইউরোপীয় চিত্রকলার এনগ্রেভিং-এ করা প্রিন্ট। এইভাবেই কলকাতার শিক্ষিত সমাজ ইউরোপীয় রীতির একাডেমিক বাস্তবধর্মী ছবির অনুগামী হয়ে ওঠে।"[৯]

অপরদিকে এই বৃহৎ আকৃতির তেলরঙের ছবি আঁকানো এবং তাকে ইংল্যান্ডে পাঠানো দুই অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। অন্যদিকে পাশ্চাত্য দর্শনের জগতে প্রাচ্যবাদ গভীর রেখাপাত করে। তখন প্রাচ্যের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের, সামাজিক রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, এমনকি প্রাকৃতিক বস্তুকেও নতুন করে জানার জোয়ার আসে। যেমন Eugene Irschick বলছেন: "British and local interpreters participated equally in constructing new institutions with a new way of thinking to produce a new kind of knowledge."[১০] এমনকি Barwell Impey তাঁর বাবা Elijah Impey সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলছেন যে, যখনি লন্ডন থেকে কেউ কলকাতায় সুপ্রিমকোর্টের সদস্য হয়ে আসত, তখনি তাদের প্রাচ্যের মানুষের আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, ধর্মবিশ্বাস, এমনকি কুসংস্কার—এইসব বিষয়ে অবহিত করানো হতো, যাতে তাদের কোম্পানির আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন বিঘ্ন না ঘটে।[১১]

কাজেই এই কোম্পানি চিত্রকলার একজন অগ্রগণ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম জজ Elijah Impey-এর স্ত্রী Lady Impey। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল ভারতবর্ষের গাছপালা এবং পশুপাখি সম্পর্কে। তিনি

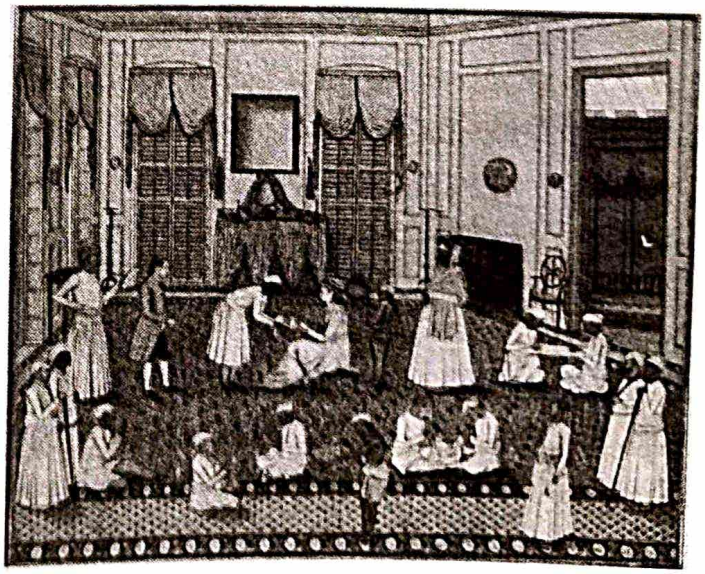

কলকাতায় তাঁর নিজস্ব বাসভবনে ছবি আঁকানোর জন্য দেশীয় পরম্পরার বহু শিল্পীকে নিযুক্ত করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জইন-আলদিন, রাম দাস, ভবানী দাস এবং আরো অনেকে। এমনকি একটি ছবিতে এও দেখতে পাওয়া যায় যে, Lady Impey তাঁর বৈঠকখানায় বসে আছেন এবং তিনি নিজে সমস্ত শিল্পী ও তাদের শিল্পকর্মের তদারকি করছেন। উনি ভারতবর্ষে থাকাকালীন তিনশোরও বেশি ছবি আঁকিয়েছিলেন, যা আজ লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড মিউজিয়াম ও পৃথিবীর বিভিন্ন সংগ্রহশালায় ছড়িয়ে রয়েছে। এই দেশীয় পরম্পরা শিল্পীদের দিয়ে আঁকানোর দুটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, পাশ্চাত্য শিল্পীদের থেকে এই দেশীয় শিল্পীদের দিয়ে আঁকানোর খরচ অনেক কম ছিল। দ্বিতীয়ত, এই শিল্পীদের পরিপ্রেক্ষিত অথবা আলো-ছায়ার জ্ঞান না থাকলেও অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। এখানে ৪নং ছবিটিতে

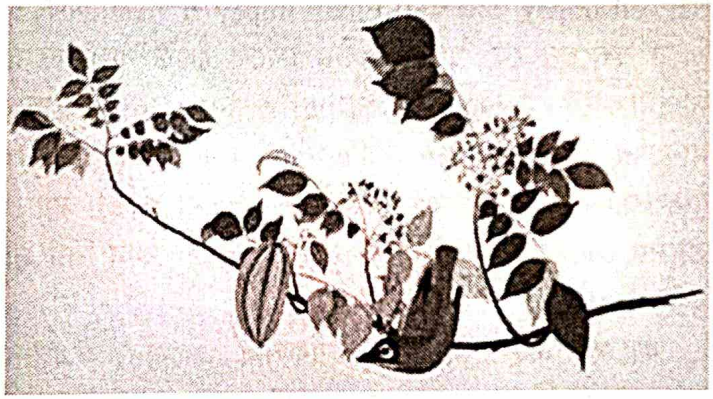

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একটি পাখি কামরাঙা গাছের ওপর বসে আছে। ছবিটির মধ্যে শুধু পাখিটিই নয়, গাছের পাতাটিরও প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও জইন-আলদিনের আঁকা এই ছবিটির মধ্যে শিল্পমাধুর্যের এবং বৃহত্তর প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ছবিটি এবং তার বিষয়বস্তু যেন নিরবচ্ছিন্ন প্রাচ্য শিল্পধারার একটি বৃন্তচ্যুত কুঁড়ি। তাই একজন কোম্পানি আর্টিস্ট যতই ভাল ছবি আঁকুক, সে কোনদিনই একজন শিল্পী বা ওস্তাদ হয়ে উঠতে পারত না। সে কেবল একজন ভাল কারিগর বা নকলনবিশ হিসাবেই স্বীকৃতি পেত। দেশীয় পরম্পরায় এই শিল্পীদের দিয়ে ছবিগুলি আঁকানো হতো তাদের শিল্পসত্তা বা নৈপুণ্যকে উন্মোচিত করার জন্য নয়, এগুলিকে আঁকানো হতো কেবলমাত্র ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় প্রাণী এবং মানবসমাজকে পাশ্চাত্য মানুষের কাছে দৃশ্যগ্রাহ্য করে তোলার জন্য।

Lady Impey ছাড়াও বোটানিক্যাল ড্রয়িং-এর আর-একজন বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন Roxburgh। তাঁর আঁকানো ছবিগুলি আজ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে রাখা আছে। এই বোটানিক্যাল গার্ডেন সম্পর্কে Maria Graham লিখছেন: "The botanical garden is beautifully situated on the banks of the Hooghly.... After having visited the garden, Dr. Roxburgh obligingly allowed me to see his native artists at work, drawing some of the most rare of his botanical treasures; they are the most beautiful and correct delineations of flowers I ever saw. Indeed, the Hindoos excel in all minute works of this kind."[১২]

কলকাতায় কোম্পানি চিত্রকলার আর-একজন খুব বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন Maria Nugent। উনি ভারতবর্ষে আসেন ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে এবং তার ঠিক চারবছর পরে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি ফিরে যান। এই সময়ের মধ্যে তিনি গঙ্গার অববাহিকা ধরে বহু জায়গায় ভ্রমণ করেন। ভ্রমণকালে তিনি এত রকমের মানুষ এবং বাড়িঘর দেখেন যে, তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে বারবার লেখেন—তাঁর মনে হয়েছিল এই সবকিছুরই ছবি আঁকিয়ে রাখবেন। ২৯ ফেব্রুআরি ১৮১২ তিনি লিখছেন: "Sir George in council.—Low and unwell myself—did not see any company.—Captain Caulfield sent me a present of wild boars' teeth. I mean to begin a collection of curiosities of all sorts, drawings & C. for my dear children."[১৩] শুধু Maria Nugentই নন, Fanny Parkes-এরও ভারতবর্ষের মানুষ ও তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া এবং তদনুরূপ ছবি আঁকানো বা সংগ্রহ করার ইচ্ছা ছিল দেখার মতো। তাঁর নিজের ভাষাতেই দেওয়া বাজার সরকারের বর্ণনা থেকে সেটা আরো পরিষ্কার বোঝা যায়—"...they dress themselves with the utmost care and most scrupulous neatness in white muslin, which is worn exactly as represented; and the turban often consists of twenty-one yards of fine Indian muslin, by fourteen inches in breadth, most carefully folded and arranged in small plaits; his reed pen is behind his ear, and the roll of paper in his hand is in

readiness for the orders of the sahib. The shoes are of common leather; sometimes they wear them most elaborately embroidered in gold and silver thread and coloured beads."[১৪] এই বিবরণ দেওয়ার কিছু পরেই আবার তিনি লিখছেন যে, তার কথা তিনি বিশেষ বোঝেন না এবং সেও তাঁর কথা বিশেষ বোঝে না। এই যোগাযোগশূন্য জগতের মধ্যেই গড়ে ওঠে শিল্পী ও তার পৃষ্ঠপোষকের সম্পর্ক এবং তার ভাষা মূর্ত হয়ে ওঠে কোম্পানি পেন্টারের একের পর এক আঁকা ছবিতে।

নবাবি দরবারে যেভাবে নবাব এবং তার অভিজাতবর্গকে কেন্দ্র করে একধরনের শিল্পরীতি আবর্তিত হতো, কলকাতায় এসে সেই শিল্পের শুধু রীতি-আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুই নয়—শিল্পী এবং তার পৃষ্ঠপোষকের শ্রেণিসম্পর্কও সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। নবাবদের দরবারি রীতি অনুসারে ছবি আঁকা ছিল বেশ কিছু শিল্পীর একটি সমবেত প্রয়াস। প্রত্যেক চিত্র-কারখানায় একজন কি দুজন ওস্তাদ থাকতেন, যাঁদের তত্ত্বাবধানে কাজ করত অন্য শিল্পীরা। প্রত্যেক শিল্পীর দক্ষতা অনুযায়ী রাজকোষ থেকে তাদের বার্ষিক ভাতা ধার্য করা হতো। কিন্তু তারা যখন কলকাতার বাজারে এসে উপস্থিত হলো, তখন তাদের এই আর্থিক নিশ্চয়তার জায়গাটা আর রইল না। পৃষ্ঠপোষকের খোঁজে তাদের ঘুরতে হলো সাহেবদের দ্বারে দ্বারে। যদিও বা তাদের ডাক পড়ল সাহেবদের কাছে, সেটা আর শিল্পী হিসাবে নয়, একজন কারিগর হিসাবে, যে তার সামনে রাখা বস্তুটি হুবহু নকল করে আঁকতে পারে অতি দক্ষতার সঙ্গে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও এই ছবিগুলির মধ্যে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দরবারি চিত্রে বেশির ভাগ সময় নবাব নিজে বা তাঁর অভিজাতবর্গ থাকত চিত্রভূমির কেন্দ্রস্থলে। কিন্তু কোম্পানি চিত্রে সাধারণ মানুষ হয়ে উঠল ছবিগুলির প্রধান বিষয়বস্তু। শুধুমাত্র বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষই নয়, সাহেবদের পালিত পশু, বাড়ি, গাড়ি, এমনকি তাদের চাকররাও এই ছবিগুলির বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। যদিও কিছু ছবিতে সাহেবদের পাওয়া যায়, তবে সেগুলো কখনই প্রধান চরিত্র হিসাবে নয়। এই বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা কোন এক করায়া বাসির আঁকা পোনি রাইডিং ছবিটির দিকে তাকাই। এই ছবিতে যে সাহেব-শিশুটি বেড়াতে বেরিয়েছে, সে শিল্পী এবং দর্শক দুজনের কাছেই একেবারে অদৃশ্য, আর প্রধান চরিত্র হিসাবে যারা রয়ে গেল, তারা হচ্ছে তার ঘোড়া এবং পরিচারকগণ। মধ্যযুগের ছবির একটি বাজার ছিল বটে, কিন্তু শিল্পী সম্পূর্ণভাবে সেই বাজারের চাহিদার ওপর নির্ভরশীল ছিল না। উনিশ শতকের কলকাতায় শিল্পীকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়ে ছিল বাজারের চাহিদার ওপর, যার জন্য শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভার পাশাপাশি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল পুঁজির বিনিয়োগ। এইভাবেই একদিন সময়ের স্রোতে বহু শিল্পী হারিয়ে গেল অথবা জীবিকার সন্ধানে সাহেবদের ছাপাখানার দ্বারস্থ হলো, যেখানে একদিন দেখা মিলেছিল লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের। ■

তথ্যসূত্র

১ Archer, Mildred, *Company Drawings in the India Office Library*, Stationary Office Books, London, 1972, p. 72

২ Nugent, Maria, *A Journal from the Year 1811 till the year 1815*, T and W Bonne, No. 29, New Bond Street, London, p. 82

৩ Bandyopadhyay, Sekhar, *From Plassey to the Partition*, Orient Longman, New Delhi, 2014, p. 71

৪ মৈত্রেয়, অক্ষয় কুমার, *ভারতশিল্পের কথা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃঃ ২

৫ চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, 'বাঙালি শিল্পী নবাবের দরবার থেকে কলকাতার বাজারে', *পরিকথা*, মে ২০১৫, পৃঃ ৩৩

৬ *Company Drawings in the India Office Library*, p. 15

৭ *Ibid.*, 2, p. 60

৮ *বাঙালি শিল্পী নবাবের দরবার থেকে কলকাতার বাজারে*, পৃঃ ৪০

৯ ভট্টাচার্য, অশোক, *কলকাতার চিত্রকলা*, কলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ২৪

১০ Irchik, Eugene, *Dialogue and History: Constructing South India, 1795—1895*, University of California Press, Berkeley, 1994, p. 6

১১ দ্রঃ Impey, Elijah Barwell, *Memoirs of Sir Elijah Impey*, Simpkin, Marshall & Co., London, 1846, p. 46

১২ Graham, Maria, *Journal of A Residence in India*, Edinburg Archibald Constable & Co., London 1813, p.

১৩ *A Journal from the Year 1811 till the year 1815*, p. 88

১৪ Parkes, Fanny, *Wonderings of A Pilgrim in Search of the Picturesque During Four and Twenty Years in the East*, Pelham Richardson, 23, Cornhill, London, 1850, p. 22

রচনাটি 'হেমচন্দ্র ঘোষ স্মারক রচনা'রূপে প্রকাশিত হলো।